SEM-VI, DSC-3

# তারাশঙ্করের ছোটগল্প

স্বপ্না দাস

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭২), প্রথম ছোটগল্প লিখেই তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবন শুরু, তিনি বলেছেন — তাঁর সাহিত্যজীবনের দুটি ধারা — একদিকে তিনি 'কল্পনাপ্রিয় কবি' অন্যদিকে 'নামে তথ্যসন্ধানী সামাজিক', তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই কথাটা প্রমান করা যায়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় 'কল্লোল' পত্রিকায় 'রসকলি' গল্পটির মধ্যদিয়েই তাঁর বাংলা সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ, যদিও বাংলাসাহিত্যে তাঁর ক্রমিক পরিচিতি ও অসাধারন প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বস্তুত গল্প ও উপন্যাস দুই শাখা দিয়েই, গল্প ও উপন্যাস দুই শিল্প-শাখায় তিনি ছিলেন সব্যসাচী ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি নিজে জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বংশগত সূত্রে যুক্ত ছিলেন, গান্ধীপ্রানিত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে কারাবরন করেছেন, নাট্যকার হওয়ার বাসনায় তাঁর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁর সমাজতন্ত্র-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, রাজনীতির সূত্রে স্বদেশভাবনা, তাঁর নাট্যকার হওয়ার আন্তরিক প্রয়াস ও ব্যর্থতা সবকিছু সম্ভব হয়েছিল তাঁর স্বদেশ, গ্রাম-বাংলার জন্মক্ষেত্র বীরভূম অঞ্চলের লালমাটির পরিবেশ ও প্রেরনায়। আঞ্চলিক জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের সীমা রচনা করে নি, ব্যাপ্তি দিয়েছে। এই ব্যাপ্তির উৎস তাঁর অসম্ভব শিল্প-ক্ষমতার কেন্দ্রেই স্থিত, তিনি জীবনযাপনের নানান সূত্রে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন স্বকীয়তায়, তাই তাঁর সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য — মাটি আর মানুষ, মাটির মমত্ব আর মানুষের মহিমা, তারাশঙ্করের আর একটি বড় কৃতিত্ব, তিনি যেভাবে ও যতটুকু বাঙালির সমাজজীবনকে, জীবনের অন্তর্গত চরিত্রকে সাহিত্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার তুলনা নেই, তারাশঙ্করের সমস্ত গল্পসম্ভারকে বিষয়বস্তুর দিক আমরা কয়েকটি শ্রেনিতে বিভক্ত করতে পারি — এই শ্রেনিবিভাগ মূলত, তারাশঙ্করের স্বকীয় সমাজদর্শন ও চরিত্র নিরীক্ষনকে সামনে রেখে —— ক) জমিদার এবং জমিদারী প্রথা বিষয়ক গল্প খ) অন্ত্যজ শ্রেনির জীবন সম্পর্কিত গল্প গ) প্রেমের গল্প ঘ) পশু ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক গল্প ঙ) বাৎসল্যের আকুতি বিষয়ক গল্প চ) অধ্যাত্ম চেতনা বিষয়ক গল্প এবং ছ) একাল-সেকালের দ্বন্দ্ব বিষয়ক গল্প।

## ক. জমিদার এবং জমিদারী প্রথা বিষয়ক গল্প

তারাশঙ্করের রচনায় পুরোনো কালের প্রতি একধরনের দুর্বলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সাহিত্যিক মনের নিয়ামকরূপে দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন জমিদারী বাড়ির সন্তান, তাঁর আমলে তাঁদের জমিদারীর ভগ্নদশা হলেও জমিদারীপ্রথা ও সংস্কারের ঐতিহ্য তখনও অটুট এবং জমিদারী ব্যবস্থার পুরাতন কীর্তি ও গৌরবকাহিনিগুলির সজীবতার মধ্যেই তিনি লালিত ও বিকশিত হয়েছেন, এর প্রভাব আমরা তাঁর 'রায়বাড়ী' ও 'জলসাঘর' গল্প দুটিতে লক্ষ করতে পারি, 'রায়বাড়ী' গল্পটির ঘটনাকাল ১৮৬৩, রাজারামপুরের প্রতাপশালী জমিদার রাবনেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে প্রজারা। প্রজারা নজরানার টাকা দেয়, জমিদার

খেতে দেয় প্রচুর মাছ, দুই আর দেয় বাঁটিচাদর ও মেরার গাড়ভাড়া। সামান্য কথার ভুল বোঝাবুঝিতে প্রজাদের হাতে জমিদারের গোমস্তা খুন হলে জমিদারের আদেশে বাগদী বাগদী গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, জমিদার বাড়িতে পুন্যাহ, নানান প্রজাসংক্রান্ত আচার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, জলসাঘরের প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা গল্পটিকে জমিদারতন্ত্রের জীবন্ত দলিল করে তুলেছে। পুন্যাহের দিন জমিদারের স্ত্রী-পুত্র নৌকাডুবি হয়ে মারা গেলে জমিদার সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। এদিকে প্রবল বন্যায় অসহায় প্রজারা আশ্রয়প্রার্থী হলে জমিদার বাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হয়। চলে যাবার মুখে নদীর ঘাট থেকে জমিদার দেখলেন, তাঁর শখের জলসাঘরে বিয়ের আসর বসেছে; আহারতৃপ্ত প্রজারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে—'অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্ব; আমরা সুখে বেঁচে থাকি,' বিচলিত হয়ে জমিদার ফিরে আসেন। এই গল্পে ২৮৬৬ সালের জমিদার চরিত্রের ভালোমন্দের দুদিকের চিত্রণে লেখকের দক্ষতার পরিচয় আছে। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

'জলসাঘর' গল্পটিকে 'রায়বাড়ী' গল্পের পরিপূরক বলা যেতে পারে। 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায় একই জমিদারবাড়ির সপ্তম পুরুষ, যার আমলে রায়-বাড়ির অর্থনৈতিক সংকট চূড়ান্ত। ঋণের জালে জর্জরিত, এ গল্পেও জমিদারপুত্রের উপনয়নের দিন জমিদার-স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা কলেরায় মারা যায়। 'রায়বাড়ী' গল্পে ছিল জমিদারী-ব্যবস্থার জৌলুসের পরিচয়, আর 'জলসাঘর'-এ ফুটে উঠেছে জমিদারী ঐতিহ্যের মর্মান্তিক জীবন-সন্ধ্যা। তবে 'জলসাঘর' গল্পে নতুন এক মহাজনী শ্রেণির উত্থান চোখে পড়ে। প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূ-সম্পত্তি চলে যায়, অন্যদিকে মহিম গাঙ্গুলীরা সেই অঞ্চলের দখল নিতে থাকে। এখানে বিশ্বম্ভর রায় ও মহিম গাঙ্গুলীর বিরোধটা সরাসরি অর্থনীতিগত, আর তাই গাঙ্গুলী বাড়ির নাচের আসরের নিমন্ত্রণ জমিদার বিশ্বম্ভর রায় প্রত্যাখ্যান করেন, সর্বস্বান্ত হয়েও জলসার আসর বসিয়ে মর্যাদার লড়াইয়ে নামতে পিছ-পা হন না। 'মুখুজ্জে মশায়' গল্পে জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন, জমিদারদের গ্রাম পরিত্যাগ ও শহরবাস এবং ব্যবসায় নেমে পড়ার কথা বালিগঞ্জবাসী জমিদার হীরেন্দ্রের মারফৎ প্রকাশ পায়। রথীন্দ্রনাথ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তাঁর রচনায় জমিদার-সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষরশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠেছে।'[২]

'বন্দিনী কমলা' গল্পে পাওয়া যায় জমিদারী অন্দরমহলের চিত্র। রাজহাটের রায়বাড়ি প্রাচীন বনেদি ঘর। এখানে ছেলেদের খাওয়া আরম্ভ হয় দেড়টায়, বাবুদের আড়াইটায়, মেয়েদের সাড়ে তিনটায় আর চাকরদের পৌনে চারটায়। সেকালের বৃদ্ধা জমিদার-গৃহিণীর ছবিটি এখানে সযত্নে রচিত, বাড়িতে গৃহপালিত প্রাণীর বিরাট সংসার। বাড়ির বউদের নামকরণ হয় হীরা, মণি, মানিক,

আতর, বেল, চাঁপা প্রভৃতি নাম দিয়ে, বাড়ির নতুন বৌ কাঞ্চন তার দিদিশাশুড়ীর কাছে গল্প শোনে কীভাবে তার শ্বশুর পাইকদের সর্দার থেকে শেষে নায়েব হয়েছিল। কোম্পানির কাছে দাদন নিয়ে শোধ দিতে না পারায় লুকিয়ে থাকা তাঁতীদের ধরে এনে খুঁটিতে বেঁধে দাদন আদায় করিয়ে দিয়ে 'দেওয়ান' হয়েছিল তার শ্বশুর। আর এসব বাড়ির পুরুষদের অনেকেরই 'ধারফটকা রোগ' অর্থাৎ 'বেশ্যাসক্তি' ছিল। কাঞ্চন শুনেছিল, লক্ষ্মীর ঘরে লক্ষ্মীদেবীকে বন্দিনী করে রাখা আছে। ঘটনাচক্রে সে ঘরের মরচে পড়া তালা খুলে সে লক্ষ্মীর বদলে, একটি নরকঙ্কাল আর বিবর্ণ-শীর্ণ একটি নামাবলী দেখতে পায়, বোঝা যায়, ইনি এ বাড়ির কোন এক পূর্বপুরুষ, গল্প শেষে এই আকস্মিকতা সৃষ্টি করে লেখক জমিদারবাড়িতে লক্ষ্মীকে অচলা করে রাখা, সম্পত্তি লাভের কারণে প্রিয়জনে হত্যা, 'যক্ষ' করে রাখার বিশ্বাস ইত্যাদি সামন্ত সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েদিয়েছেন। — 'কাঞ্চনবউ দেখিল, সকলেই দেখিল একরাশি চুল; বিবর্ণ হইয়া গেছে, কিন্তু তবু অনুমান করা যায় — সে চুল এককালে ভ্রমরের ন্যায় কালো এবং কুঞ্চিত ছিল, মেঝের উপর আরও পড়িয়াছিল — একখানা বিবর্ণ জীর্ণ কাপড় কি চাদর, পাড়ের চিহ্ন দেখা যায় না — আর একখানা নামাবলী।' তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি'তে যেমন আছে জমিদারী দাপট, লালসার চিত্র, তেমনি ~~আছে পরবর্তীকালে রচিত~~ 'দোল', 'প্রতিমা' গল্পেও জমিদারী প্রথার নির্মমতার চিত্র ধরা পড়ে। 'মোষকথা' গল্পে ধরা পড়েছে হাল আমলের জমিদারীর বৈশিষ্ট্য, 'সনাতন' গল্পে আছে 'চারপুরুষের চাকর' হয়ে থাকার কথা, এরকম অজস্র উদাহরণ তারাশঙ্করের ছোটগল্পে ছড়িয়ে আছে।

খ- অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন সম্পর্কিত গল্প

কল্লোলের লেখকদের রচনায় অন্ত্যজ জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হলেও সেগুলি যথাযথ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারাশঙ্করের বিশিষ্টতা হল, অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত, আদিবাসী, সভ্যতার আলো স্পর্শ বিরহিত জীবনের ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি অনেক বেশি অগ্রণী, অনেক বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। আর এর মূলে ছিল, জীবনকে নিবিড় করে দেখার সুযোগ — যার সূচনা হয়েছিল লাভপুরে পারিবারিক আবহাওয়ায়। জীবনের ও জীবনপ্রেমের মূলীভূত রহস্যকে বুঝতে গিয়ে তিনি সভ্য-ভদ্রজীবন ও তার মানুষগুলিকে আধার হিসেবে নেন নি সব সময়ে, নেমে এসেছেন একেবারে অশিক্ষিত, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনায় ভরপুর পরিবেশে,

'তারিণী মাঝি' গল্পটি লেখকের এমন জীবন-ভাবনার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ময়ূরাক্ষী নদীর পরিবেশে লালিত তারিণীর জীবনে বিত্তের দীপ্তি নেই, অল্পেই সে সন্তুষ্ট। ময়ূরাক্ষী নদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য প্রধানত নিয়ন্ত্রিত। সে আটমাস থাকে শুষ্ক, কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রাক্ষসীর মত ভয়ংকরী।' তখন যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে অসম্ভব প্লাবনে দুকূল